**১. সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বোধন কবিতায় মধ্যে কবি যে সমাজচেতনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, তার পরিচয় দাও।** ১০

**অথবা, 'বোধন' কবিতায় কবি কীসের বোধনের কথা বলেছেন? প্রসঙ্গত এই কবিতায় কবির সমাজচেতনার পরিচয় দাও।** (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩) ৫+৫

**উত্তর ➤** সমকালে যেসব অগ্রজ কবিরা বাংলা কাব্য অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তাদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সমর সেন উল্লেখযোগ্য। স্বভাব-ধর্মে, সমাজ-চেতনায় এরা যে সকলেই সমগোত্রীয় ছিলেন তা নয়। অলংকরণে, অঙ্গসজ্জায়, বিষয়-বৈচিত্র্যে এঁরা বাংলা-কাব্যের জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

এই পর্যায়ে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ মাত্র এই ক'টি বছর অসামান্য শক্তিসম্পন্ন কবিতা লিখেছিলেন। রচনার অন্তর্সত্য, সংবেদনশীলতা তাঁর রচনার জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। কবিতাকে শব্দবিলাস থেকে মুক্ত করে বিষয় ভাবনায়, বিপ্লবী চেতনায় সংগ্রামের তীব্রতা দিয়ে পুনর্জীবিত করেছেন কবি সুকান্ত।

১৩৫০ বা ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের আঘাত ভারতবর্ষের কোনো কোনো অংশে পড়লেও মূলত বাংলাদেশেই চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির রুগ্ন চেহারাটি প্রকটিত হয়ে ওঠে এই মন্বন্তরের মধ্য দিয়ে। দেশবিভাগের আগে বিশ শতকে বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে এত বড়ো বিপর্যয় আর আসেনি। সরকারি এবং বেসরকারি সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এ দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও স্থানীয় প্রশাসন একটু সচেষ্ট হলেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণহানি থেকে রক্ষা করা যেত। ১৯৪১ সালের আদমশুমারি থেকে দেখা যায় বাংলায় কৃষিনির্ভর পরিবার ছিল ৭৫ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ পরিবার ছিল বর্গাদার এবং ২০ লক্ষ পরিবার ছিল খেত-মজুর। এককথায় প্রায়

অর্ধেক পরিবার ছিল ভূমিহীন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে প্রাকৃতিক সম্পদের স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর মূলত নির্ভর করা হতো, কোনো উন্নয়নের প্রয়াস করা হয়নি। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি বা পরিকল্পিত সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের কোনো অগ্রগতি ঘটানোর চেষ্টাও ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল চিরাচরিত সামন্ত শোষণ, যেটি কৃষির অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল।

এইসব কারণে খাদ্য ঘাটতি চলে এসেছে বিশের দশক থেকে। বছরের ৫২ সপ্তাহের মধ্যে ১৯২৮ সালে খাদ্যের যোগান ছিল ৪৫ সপ্তাহের, ১৯৪১ সালে ৩৯ সপ্তাহের। ১৯৪২ সালেও ভালো ফসল হয়নি। এই বছরই মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রচণ্ড ঝড় ও বন্যার ফলে ২৫ লক্ষ মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং প্রায় চার হাজার বর্গমাইল এলাকার ফসল নষ্ট হয়। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষক সভা অধিক ফসল ফলানোর কর্মসূচি গ্রহণ করে। তৎসত্ত্বেও ঘাটতি ছিল প্রায় তিন সপ্তাহের এবং এর ফলস্বরূপ বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

যুদ্ধে জাপানের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অর্থনীতিও ক্রমশ যুদ্ধমুখী হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় টাকার খেলা এবং যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার পরিবেশে মজুতদার, কালোবাজারি ও ব্যবসাদাররা মরণ ব্যবসায় মেতে ওঠে। এই অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি দেশের দরিদ্র, খেতমজুর, ছোট চাষি, নিম্ন আয়ের মজুর শ্রেণির মানুষকে নিদারুণভাবে আঘাত করেছে। গ্রামের মানুষেরা একমুঠো খাবারের আশায় শহরের দিকে এলো। সরকার মুনাফা লোভী ব্যবসায়ী ও কালোবাজারিদের সৃষ্টি এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৯৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়।

এই দুর্ভিক্ষ যে শুধু লক্ষ লক্ষ প্রাণ নিয়েছে তা নয়, বাংলাদেশের সমাজ-জীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। একমুঠো চালের চেয়ে নারীদেহ অনেক সস্তা হয়ে গেল, অবাধে চলতে লাগল নারী কেনা-বেচা। শহরের পথে পথে তখন বুভুক্ষু মানুষের মিছিল। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

একদিকে ফ্যাসিবাদ, অন্যদিকে মন্বন্তর এই দুই দানবীয় মূর্তির বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সংগ্রামের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনসমাজ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের অসহায়তা ও বাঁচার সংগ্রামকে ভাষারূপ দিয়েছেন। কবি সুকান্ত এই সময়ের কবি। বাংলার মন্বন্তর শুধু তাঁর অনুভবে নয়, তাঁর অভিজ্ঞতায় ছড়িয়ে রয়েছে। কবি সুকান্ত বৈপ্লবিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বহু কবিতায়, বিশেষ করে মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত 'বোধন' কবিতায়।

বঞ্চনার জ্বালায় ঘরে আবদ্ধ না থেকে কবি জনগণকে সমবেতভাবে বাইরের জগতে এসে দাঁড়াতে বলেছেন। মার খাওয়া মানুষগুলোকে বলেছেন, এইভাবে ধুঁকে ধুঁকে সংসার সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়া যায় না। ধূর্ত-প্রবঞ্চক পুঁজিপতি, যারা দরিদ্র জনগণের শেষ গ্রাসটুকু কেড়ে নিয়েছে, তাদের ক্ষমা করে গরীব মানুষেরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। খেটে খাওয়া গরীব চাষিদের মাঠের শস্য চুরি করে মজুতদাররা গুপ্তকক্ষে লুকিয়ে রাখে। গরীব মানুষেরা খিদের জ্বালায় প্রহর গোনে আর পুঁজিপতিরা কোটি কোটি মুদ্রা গোনে। ভাণ্ডার তাদের পূর্ণ, তবু চাহিদার শেষ নেই। দরিদ্র মানুষকে তারা লোভ দেখায়, কাছে ডাকে।

দুর্বিপাকের ঘেরাটোপে পড়ে ঘুরপাকে খেয়ে মরে সাধারণ মানুষ।

কবি সুকান্ত যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা হল শোষণহীন ভারতবর্ষ। স্বদেশের জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য তিনি বর্ম ধারণ করে সৈনিক কবি হয়ে উঠেছেন। তিনি মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন। তার সংগ্রাম হলো বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে। দরিদ্র জনগণকে একদিকে কবি যেমন জেগে উঠতে বলেছেন, অন্যদিকে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কবি জানতে চেয়েছেন, কেন সাধারণ মানুষের এতো মৃত্যু হচ্ছে? বহু গ্রাম উজার হয়েছে, লক্ষ লক্ষ প্রাণ নিঃশেষিত হয়েছে। কবি এখানে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে শ্রমজীবী মানুষের জয়গান করতে চান।

কবি বলেছেন যে, পৃথিবী তার লোভের অস্ত্র দিয়ে দরিদ্র মানুষের অন্ন-বস্ত্র কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে, সেই লোভী হাত ভেঙে দিতে হবে। লড়াই করতে হবে, রক্ত দিতে হবে। ফসল এবং জমিকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে।

পুঁজিবাদীদের একদিন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সত্যের জয় হবে, মানবতার জয় হবে। বহুযুগ বাদে জাদুঘরে নৃতত্ত্ববিদ্ মানুষ খোঁজার চেষ্টা করবে। কিন্তু মজুতদার আর সাধারণ মানুষের হাড়ে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই কবি বলেছেন প্রতিশোধ নিতে হলে শ্রমজীবী মানুষকে জেগে উঠতে হবে। জেগে ওঠার জন্য কবি সুকান্ত শক্তি প্রার্থনা করেছেন। নজরুল, 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় বলেছেন—

প্রার্থনা করো— যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস।
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাঁদের সর্বনাশ॥

সমস্ত রকম অন্যায় এবং ভীরুতাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। দরিদ্র মানুষকে একত্রিত করে মহাজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বঞ্চিত মানুষেরা যদি জেগে উঠতে না পারে, তবে সমগ্র মানবজাতিকে সর্বনাশের মুখে পড়তে হবে। শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কেউ যদি সামিল না হয়, তবে কবি বুঝবেন যে তিনি মানুষ নন, দেশদ্রোহী। যে ভারতবর্ষ থাকার মাটি দিয়েছে, মুখে তাদের অন্ন ও জল দান করেছে, সেই ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হবে। 'আমি' এবং 'তুমি'— উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে কবি আমাদের সংহতির জয়কে বড়ো করে দেখিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কবি সুকান্ত দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন তা-ই হল 'বোধন'। এই 'বোধন' হল সংহতির বোধন—

তা যদি না হয় মাথার ওপরে ভয়ংকর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর;

ধূর্ত বণিক মজুতদার, কালোবাজারিরা স্বদেশপ্রেমের ব্যঙ্গমা পাখি। ওইসব পাখিরা দেশপ্রেমের বাণী বলে ভুলিয়ে রাখতে চাইবে। কিন্তু ওদের কথা তুললে চলবে না। ওইসব মজুতদারদের প্রাসাদে বহু মৃত মানুষের হাড় জমা হয়েছে। পৃথিবীর মন্বন্তর যেহেতু তারা সৃষ্টি করেছে, তাই কবির ক্রোধ তাদেরই ওপর বর্ষিত হয়েছে।

কুচক্রান্তকারীরা অগণিত দরিদ্র মানুষের প্রাণ নিয়েছে। কবির প্রিয়াকেও তারা কেড়ে নিয়েছে। তার ঘর বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। সে কথা কবি কখনো ভুলতে পারছেন না। তিনি

সাধারণ মানুষের কবি। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন আদিম হিংস্র মানবিকতার তিনি যদি কেউ হন, তবে স্বজন হারানো শ্মশানে তাদের চিতা তিনি তুলবেন। শোষক সম্প্রদায়ের অবসান ঘটিয়ে তিনি শ্রমজীবী মানুষের জয়পতাকা তুলবেন। ঈশ্বরকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তাঁর আসনে বসে আছে শয়তানের দল। তাদের ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিপীড়িত মানুষের অভ্যুত্থান ঘটাতে চান কবি। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষ এর ফলে জেগে উঠবে। তাই তিনি বলেছেন, পুঁজিবাদী সমাজ ধ্বংস হবে, সৃষ্টি হবে নতুন সাম্যবাদী সমাজ। কবি বলেছেন—

শোনরে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।

'বোধন' কবিতাটি কবি সুকান্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবি রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁর প্রায় শেষতম কবিতা 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'-তে অত্যাচারীদের উদ্দেশ্যে যে তীব্র ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেছেন, কবি সুকান্ত যেন তীব্রতর কণ্ঠে সেখানে থেকেই তাঁর এই 'বোধন' কবিতাটি আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ছিল খুব ছোটো। পক্ষান্তরে 'বোধন' কবিতাতে দীর্ঘায়িত বিশ্লেষণ রয়েছে।